শিক্ষাখাতে সমস্যা চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ মোঃ ইয়াছিন মজুমদার

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি শিক্ষাখাতকে গতিশীল করার নিমিত্তে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য একটি উপকমিটি গঠন করেছে। একজন শিক্ষক হিসেবে নিম্নে এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি হয়নি, ফলে স্কুল-কলেজ ও উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই অবস্থা', ভর্তি সমস্যাসহ অনেক সমস্যা এ কারণে সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যথাযথ পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। যতত্রত্র ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠছে প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রাইভেট এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ব্যয় তুলনামূলক বেশী হওয়ায় দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা সেখানে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিকা থাকতে হয়, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাধারণ তহবিল ও সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয় তারপর শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এমপিও ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় শিক্ষকদের বেতন বহন করতে হয়। পূর্বে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ বেশী ছিল, ভূসম্পত্তির মূল্যও কম থাকায় জনগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসত। বর্তমানে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও ভূসম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার শর্তগুলো শিথিল করতে হবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি প্রাইমারী স্কুল/ইবতেদায়ী মাদরাসা স্থাপন নিশ্চিতকরণ, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদরাসাসমূহকে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমসুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানসমূহে যুক্তিসঙ্গত শাখা খোলা ও শাখা হিসেবে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের পুরুষ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রী নির্ধারণ করায় মেধাবী ও আধুনিক মন-মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে, যা একটি ভাল দিক। অপরদিকে মহিলা প্রার্থীর শিক্ষাগতযোগ্যতা এসএসসি ও ৬০% কোটা সংরক্ষিত। কোটা প্রসঙ্গ বাদ দিলে ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের কারণে পুরুষের তুলনায় মহিলা শিক্ষিকা আসছে না। এ ক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগতযোগ্যতা অভিন্ন রাখা প্রয়োজন।

প্রাইমারী স্কুলে ছোট শিশুরা লেখাপড়া করে। অনেক সময় তারা মলমূত্রও ত্যাগ করে। সেখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, ঘন্টা বাজানো, বিভিন্ন জরিপ ও উপবৃত্তির কাগজপত্র তৈরী- সব কিছু শিক্ষককে করতে হয়। ফলে মানসম্মত পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে একজন অফিস সহকারী ও একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগদান প্রয়োজন। সে সাথে বর্তমানে প্রচলিত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৮ম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষা বাদ দিয়ে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা সরকারীভাবে গ্রহণ ও উত্তীর্ণ সনদের ভিত্তিতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শূন্যতা একটি বিরাট সমস্যা। একটি বিষয়ের শিক্ষক পদশূন্য থাকলে অন্য শিক্ষক দিয়ে তা চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। চালালেও তা মানসম্মত হয় না। তাই পদশূন্য হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষক আসার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ীভাবে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা এবং অস্থায়ী সময়ের বেতনভাতা সরকার থেকে পাওয়ার ব্যবস্থা হলে পাঠদানে ধারাবাহিকতা রক্ষা হবে। ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যেহেতু নিবন্ধন নামক একটি মানসম্মত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক বাছাই হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে নিয়োগ বোর্ডে মহাপরিচালকের/বিশ্ববিদ্যালয়ের/বোর্ডের প্রতিনিধিকে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য রাখার বিষয়টি বাদ দিয়ে যে কোন সরকারী স্কুল/কলেজের একজন শিক্ষককে সদস্য রাখা ও শুধু মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অথবা নিবন্ধন পদ্ধতি বাতিল করে শিক্ষক নিয়োগ কমিশন গঠন করে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে সনদ প্রদান ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি কর্তৃক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগে সবচেয়ে বড় সমস্যা বিধি-বিধানগত। দেখা যায় একজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হল। তিনি যেদিন যোগদান করলেন সেদিন একটি পরিপত্রের মাধ্যমে কিছু বিধি-বিধান পরিবর্তন হল। ফলে সে নিয়োগকৃত শিক্ষকের কাগজপত্র এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে আটকে গেল। আবার অনেক বিধি-বিধান পরিবর্তনের বিষয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানতে থাকে না। ফলে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক এমপিওভুক্ত হতে পারে না। অনেক শিক্ষক এ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যারা এ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের পূর্বে অন্যত্র এমপিওভুক্তি ছিলেন। এখন পূর্বের চাকরি হারালেন নতুন প্রতিষ্ঠানে ও এমপিওভুক্ত হলেন না, যা সম্পূর্ণ অমানবিক। তাছাড়া বিধি-বিধান অনুযায়ী আবেদনপত্র বাছাই করে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। প্রার্থীদের বিধি-বিধান জানার কথা নয়। এ সমস্যা সমাধানে নিয়োগ বিধি-বিধান মহাপরিচালক অফিসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ করে রাখার ব্যবস্থা করা কোন বিধি পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিক সংযোজন-বিয়োজন করে কপি আপটুডেট করে রাখা হলে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পূর্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধিত নিয়োগ নীতিমালা মহাপরিচালক অফিস থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করবে এবং সে আলোকে বিজ্ঞপ্তি দেবে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক নিয়োগ বিলম্বিত হলে ইত্যবসরে কোন নীতিমালা পরিবর্তন হলেও বিজ্ঞপ্তি প্রদানকালে নীতিমালা আলোকে নিয়োগ করা হলে তাকে এমপিওভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

একজন শিক্ষক দীর্ঘদিন চাকরি করার পর কোন কারণে ছয় মাস চাকরিরত না থাকলে তার পূর্বেকার সব অভিজ্ঞতা বাতিল বলে গণ্য হয়। অভিজ্ঞতা লাগে এমন পদে তিনি পূর্বে চাকরি করলেও নতুনভাবে সে পদে আবেদনও করতে পারেন না। আর অভিজ্ঞতা লাগে না এমন পদে চাকরি করলে তিনি প্রারম্ভিক স্কেলে যোগদান করতে পারেন। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত উচ্চ স্কেল থেকে বঞ্চিত হন। এ অমানবিক বিধান সম্পূর্ণ বাতিল করা প্রয়োজন। কোন কারণে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত বা বেতন বন্ধ রাখা হলে তিনি আইনের আশ্রয় নিয়ে চাকরি ফিরে পেলেও বকেয়া বেতন পাওয়া দুষ্কর। এ জাতীয় বেতন বা এরিয়ারসহ বকেয়া বেতন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

অনেক সময় দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা/মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতিমালা পরস্পর দ্বন্দ্বযুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। ফলে নিয়োগ এমপিওভুক্তিসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ বাকি প্রতিষ্ঠানসমূহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে কোন একটির অনুসরণ অথবা সব নীতিমালার সমন্বয়ে একটি মাত্র সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন আবশ্যক। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে মেধাবীদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। কেননা শিক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ বেসরকারী। বর্তমানে শতভাগ বেতন সরকারী তহবিল থেকে বহন করা হচ্ছে বিধায় ছাত্র বেতন সরকারী কোষাগারে জমা হলে সব প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণ খুব ব্যয় বহুল হবে না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারী-বেসরকারী দু'ধরনের না রেখে সরকারীকরণ করা হলে শিক্ষাখাতে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

বেসরকারী শিক্ষকদের বদলির ব্যবস্থা করলে একস্থানে দীর্ঘদিন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ কমবে। পরস্পর অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের সুযোগ বাড়বে। ফলে শিক্ষার মান বৃদ্ধি হবে। ফলাফল ভাল হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পুরস্কৃত করার বিশেষ ব্যবস্থা করা হলে ভাল পাঠদানে উৎসাহ সৃষ্টি হবে।

প্রধান শিক্ষক ও অফিস সহকারীগণ সার্বক্ষণিক প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে হয় বিধায় প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন তাদের আবাসিক ব্যবস্থা করা হলে প্রতিষ্ঠান তদারকি বৃদ্ধিসহ সার্বিক কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পাবে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অবকাশ ধরনের বড় বন্ধে বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরম ফিলাপ, রেজিস্ট্রেশন ধরনের কার্যাদির বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ফলে কার্যসম্পাদনে সমস্যাসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অফিস সহকারীদের বন্ধ ভোগ করা হয় না। বন্ধের সময় এ জাতীয় কার্যাদেশ প্রদান না করার প্রতি দৃষ্টিদান এবং গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অবকাশ ধরনের বড় বন্ধ কমিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের সংরক্ষিত ছুটি বৃদ্ধি করা হলে প্রচণ্ড তাপদাহ। বর্ষণ ইত্যাদিতে এ বন্ধ কাজে লাগানো যাবে। অপরদিকে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়, এ সময় গেজেটে শীতকালীন অবকাশ থাকায় কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক ব্যাপক অনিয়ম করলেও পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুযোগ প্রতিষ্ঠান প্রধানের থাকে না। ঐ শিক্ষক যদি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অথবা স্থানীয় প্রভাবশালী অথবা কমিটির কারো আত্মীয় অথবা তিনি যদি কমিটির কোন সদস্যকে ম্যানেজ করতে পারেন সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান অসহায়।

(চলবে)

যুগান্তর
তারিখ ... 26 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...